পুষ্টিবাগান

কী ?

ঘরোয়া বাগান, অর্থাৎ প্রধানত: নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়ির লাগোয়া জমিতে করা বাগানেরই একটি বিশেষ ধরণকে আমরা পুষ্টিবাগান বলি। সাধারণত ঘরোয়া বাগান অল্প জায়গায়, অল্প জলে-শ্রমে ও অল্প খরচে হয়। এই বাগানে সার হিসেবে গৃহপালিত পশুপাখির বিষ্ঠা, শাকসবজির খোসা, ডালপালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পোকামাকড় রুখতে, মারতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কৃত্রিম সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি রসায়ন ব্যবহার করা হয়না, বরং উপযুক্ত ফসল-চক্র ও মিশ্রচাষের ওপর জোর দেওয়া হয়।

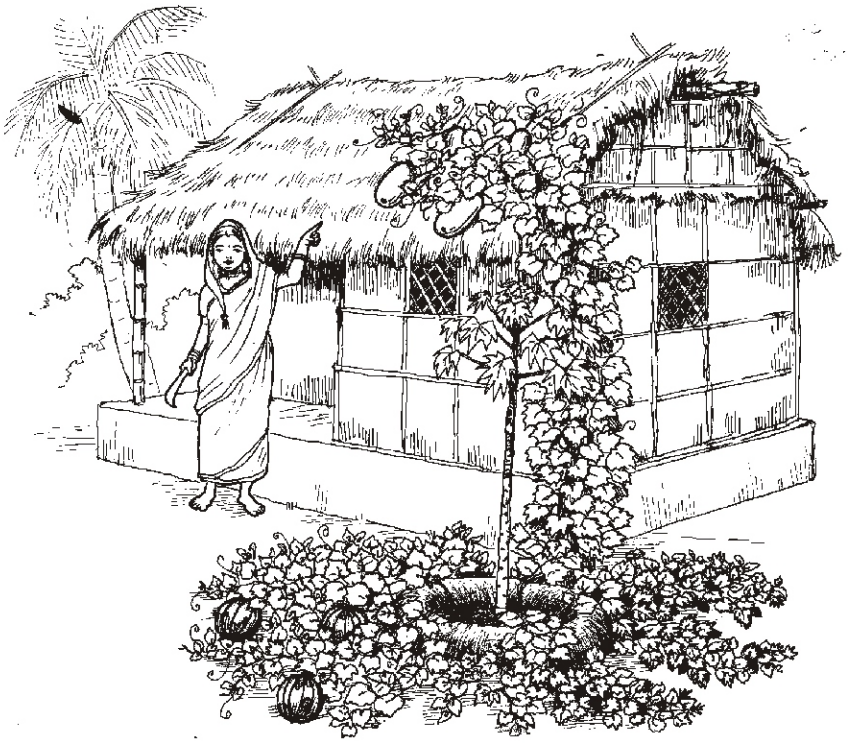

পুষ্টিবাগানে এগুলি তো করা হয়ই, উপরন্তু চেষ্টা করা হয় এমন সব গাছ-গাছালি বাছতে যেগুলির পাতা,ফুল, ফল ইত্যাদি দিয়ে প্রায় সারাবছর ধরেই আমাদের শরীরের কিছু জরুরি পুষ্টিকর তত্ত্বের চাহিদা মিটতে পারে। যেসব গাছ-গাছালি স্থানীয় জলহাওয়ায় সহজে বাড়ে, যাদের বীজ বা কাটিং সহজেই পাওয়া যায় বা যোগাড় করা যায়, সেগুলিকে এই ধরনের বাগানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণত ঘরোয়া এবং পুষ্টিবাগান দুটি ক্ষেত্রেই কিছু বাহারি বা ফলের গাছ, কিছু ভেষজ ও কিছু বেড়ার গাছ লাগানো হয়। কম জায়গা নেয় ও একাধিকবার বা অনেক সময় ধরে ফল দেয়, এমন কিছু গাছ-গাছালিও লাগানো হয়।

কেন :

১। **প্রধানত:** বিষমুক্ত ও পুষ্টিগুণে ভরপুর তাজা শাকসবজি, মশলাপাতি, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য।

২। **দ্বিতীয়ত:** বাড়তি শাকসবজি, মাছ, ডিম ইত্যাদি বিক্রি করে প্রধানতঃ মহিলা বাগানিদের আয় ও সঞ্চয় কিছুটা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

৩। **তৃতীয়ত:** নিজের পছন্দের গাছগাছড়া, পশুপাখি, ফলমূল ইত্যাদি ধরে রাখার জন্য। বাগানে ও খাবারে বৈচিত্র বজায় রাখতে পারলে, স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তিকেও অনেকটাই ধরে রাখা যায়।

৪। **চতুর্থত:** বীজ ফসলের ও পশুপাখির জাত ইত্যাদির ওপর ছোট চাষিদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং স্থানীয় মাটি, জল-হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে এরকম গাছগাছড়া, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি টিঁকে থাকতে পারে, যদিও বাজারে তাদের দাম হয়তো কম। ফলে চাষ ব্যবস্থাও টেঁকসই হয় ও ছোটখাটো ঝড় ঝাপটা, দুর্যোগ ইত্যাদি সহ্য করে বাগান তাড়াতাড়ি তার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

৫। **পঞ্চমত:** বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন থাকে। বর্জ্য জল, বাগানের আগাছা, পশুপাখির মলমূত্র সবই উৎপাদনের কাজে লাগে এবং এগুলি পুর্নচক্রায়ণের ফলে মাটির উর্বরতা অনেকটাই ধরে রাখা যায়।

৬। **এছাড়াও :** বাড়ির মানুষজন এবং পোষা পশুপাখির কোনো রোগ-বালাই হলে, হাতের কাছেই প্রাথমিক শুশ্রুষার জন্য প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া পাওয়া যেতে পারে।

৭। **সবশেষে :** বাগানের দেখাশোনা করার মধ্যে দিয়ে শরীর ও মন ভালো থাকে; এছাড়াও শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পরিবেশ ও প্রকৃতির ব্যাপারে অনেক কিছু শেখার ও বোঝার সুযোগ থাকে।

কীভাবে:

১। **প্রথমেই প্রয়োজনের কথা ভাবা দরকার :** একজন প্রাপ্তবয়স্কের প্রতিদিন ৬০০-৭০০ গ্রাম মতো শাকসবজি খাওয়া দরকার। এর মধ্যে ৩৩% মতো সবজি কাঁচা বা তাজা ফল হিসেবে খেতে পারলে ভাল হয়। কিশোর-কিশোরীদেরও শরীরের চাহিদা প্রায় একই। দশ বছরের নীচের শিশুদের এর অর্ধেক পরিমাণ সবজিও ফল হলেই চলে। এর অর্থ হল একটি গড় পরিবারে, প্রতি সপ্তাহে ১২ থেকে ১৫ কিলো কাঁচা শাকসবজি দরকার হয়। পুষ্টিবাগান-এর উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশে এমন সবজি ফুল-ফল, বা মশলাপাতি হওয়া উচিত, যা রান্না না করে বা অল্প আঁচে ২-৪ মিনিট ভাপিয়ে নিয়ে বা অল্প সিদ্ধ করেই খাওয়া যায়।

২। **কতটা জায়গা, জল ইত্যাদি আছে ?** মাথাপিছু ৯ বর্গমিটার ('স্কোয়ার' মিটার) বা ১০০ বর্গফুট জায়গা সবজি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। ফলের গাছ, মাছের পুকুর-ডোবা, ছাগল-মুরগি, খরগোশ-শুয়োর-হাঁস ইত্যাদির জন্যও সম-পরিমাণ জায়গা থাকলে ভালো হয়। তবে জায়গা কম থাকলেও বহুতল মাচা, ঝুলন্ত টব, বস্তার বাগান ইত্যাদির মাধ্যমে অন্ততঃ কিছু সবজি, ফল, ডিম, মাছ ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। বেশি জায়গা ও জলের যোগান থাকলে দানাশস্য, ডাল, কন্দজাতীয় ফসল ইত্যাদিও উৎপাদন করা যায়। উর্বর মাটি হলে, শুকনো মরশুমে প্রতি বর্গমিটার জায়গায়, প্রতি সপ্তাহে ৩০ থেকে ৪০ লিটার জল দিতে পারলে প্রায় সব ধরনের চাষই করা সম্ভব, জল কম থাকলে ফসল সাবধানে বাছাই করতে হবে। পাতা ও ফলজাতীয় সবজির জলের চাহিদা বেশি, মূল ও কন্দের জলের চাহিদা কম আর শুঁটিজাতীয় ফসল আরো কম জলে উৎপাদন করা সম্ভব। বাগানের দেখাশোনার জন্য দৈনিক অন্তত: ৪০-৫০ মিনিট সময় দিতে পারলে ভালো হয়।

৩। **মাটির গড়ন ও তার ভিতরের জীবনচক্র :** বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলস্বরূপ মাটির উপর ও ভিতরের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে ও জৈব বস্তু ধরে রাখার ক্ষমতা কমছে। মাটি জমাট বাঁধায়, তার ভিতরে অক্সিজেনের ভাগও কমছে, ফলতঃ উপরিতলের নানা অণুজীব, কেঁচো ইত্যাদির সংখ্যা কমে আসছে। জমির ভেতর চলাফেরার জন্য আলাদা পথ তৈরি করে, জৈবসার; কেঁচো সার, তরলসার, চা-কম্পোস্ট, বায়োগ্যাসের 'স্লারি' ইত্যাদি ব্যবহার করে, ও মাটির সাথে ধানের তুষ পোড়ানো কাঠকয়লা মিশিয়ে; মাটির উর্বরতা ও জল ধরার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

তরলসার : প্রতি বর্গমিটার জমিতে, প্রতি সপ্তাহে এক লিটার মতো দিতে পারলে ভালো। কেঁচো সার, ভালোভাবে পচানো কম্পোস্ট ইত্যাদি প্রতি বর্গমিটারে, প্রতি চারমাসে এক ঝুড়ি (২০-২৫ কি.গ্রাম) মতো ব্যবহার করতে পারলে ভালো ফল

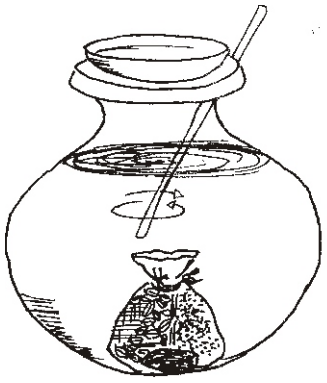

রোজ দুবেলা ৫ মিনিট নাড়ালে ২১ দিনে তৈরি হয়ে যাবে।

গোবর, ছাগল বা মুরগীর বিষ্ঠা

থেঁতো করা স্থানীয় গাছ-গাছড়ার পাতা

জল (বৃষ্টির জল বা পুকুরের জল হলে ভালো হয়। কলের জল, বালি, কাঠকয়লা মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নিলে ভালো।)

৪। **জলের জোগান ও ব্যবহার:** এমনিতেই বৃষ্টিপাত অনিয়মিতভাবে বণ্টিত, বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে বর্ষাকাল শুরু হওয়ার সময়, অনেক জায়গাতেই পাল্টে যচ্ছে। তাই জলের জোগানে টান পড়া স্বাভাবিক। ঘরোয়া **পুষ্টিবাগানে,** তাই বৃষ্টির সময় ছাদের জল ধরে রাখা,কম জলে-বিন্দু বিন্দুতে সেচ, মাটির নীচে কলসী, বোতল বা পাইপ দিয়ে সেচ, প্রভৃতি জল বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মাটির উপরিতল 'মাল্চ' বা আচ্ছাদক ফসল দিয়ে ঢেকে রাখা খুবই দরকার। এছাড়াও বাগানের চারদিকে ঘন বেড়া দিয়ে বাতাসের গতি কমিয়ে আনা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকারি। ছোট পুকুর বা চৌবাচ্চায় ছাদের জল ধরে রাখা যেতে পারে। স্নান বা বাসন ধোওয়ার জল, কাঠকয়লা ও বালির মধ্যে দিয়ে চালিয়ে শোধন করে, সেচ দেওয়াও সম্ভব। শুকনো মরশুমে শাকসবজি না ফলাতে পারলেও, নানারকম ঝোপ ও গাছের কচিপাতা খাওয়া সম্ভব। সজনে,'কাটুক', নিম, কারিপাতা, সাদা কাঞ্চন, বকফুল ইত্যাদি গাছের পাতা এরই কিছু উদাহরণ।

৫। **উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য :** প্রধানত: সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব, রূপালী বিপ্লব ইত্যাদির ফলে, গাছপালা ও পশুপাখির অনেক প্রজাতি কৃষিজগৎ ও প্রাকৃতিক জঙ্গল,জলাশয় ইত্যাদি থেকে হারিয়ে গেছে বা যেতে বসেছে। আবহাওয়া পরিবর্তন নানাভাবে এই প্রজাতি বিলোপের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। ঘরোয়া ও **পুষ্টিবাগানের** জন্য ফসল-গাছ-পশুপাখি বাছাই যেহেতু বাজার-দামের বদলে তাদের গুণগত মান দিয়ে চালিত হয়, তাই এখানে স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস, স্বাদ ইত্যাদির ভিত্তি, বীজ সংরক্ষণের সম্ভাবনা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাপ সহ্য করতে পারে ও পতিত জমি বা জলাশয়ের ধারে আপনা আপনিই হয়, এরকম চাষ না করা নানান লতাপাতা যেগুলি খেতে ভালো ও যাদের পুষ্টিগুণ বেশি সেগুলি সংগ্রহ করা হয় ও অনেক ক্ষেত্রে **পুষ্টিবাগানে** বা তার আশেপাশে চাষও করা হয়। কাঁটা নটে, বেথুয়া শাক, জল কলমি, তেলাকুচা, থানকুনি প্রভৃতি এরই কিছু উদাহরণ। দেশী জাতের ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি, পায়রা, শুয়োর, গরু, কাদার মাছ, গেঁড়ি-গুগলি, কাঁকড়া-চিংড়ি ইত্যাদির সহ্যক্ষমতা বেশি, খাদ্যের চাহিদাও কম, তাই এগুলিকে **পুষ্টিবাগানে** চাষ করা হয়।

এইসব পশুপাখি ও জলজপ্রাণীর খাদ্য হিসেবে যে'সব গাছের পাতা, কৃষি বর্জ্যের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়ানো যায়, এরকম শীঘ্র বর্ধনশীল গাছ-গাছালি লাগানো এবং ব্যবহার করা হয়। তুঁত, কাঞ্চন, জয়ন্তী, সুবাবুল ইত্যাদি ঝোপ বা গাছ, তরুকলা, অপরাজিতা, 'সেনট্রো', গাইমুগ প্রভৃতি লতা এর কিছু ভালো উদাহরণ।

৬। **ফসল বাছাই :** বেশিরভাগ শাকসবজি ও ফলমূলের দাম এখন বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। বাজারে এখন কিছু সবজি বারোমাসই পাওয়া যায়। এগুলি বয়ে নিয়ে আসা ও শীত-ঘরে রাখার জন্য কিন্তু প্রচুর জ্বালানি খরচ হয় এবং এগুলি ভাণ্ডারণে নানা বিষ ব্যবহৃত হয়। পরে তাজা দেখানোর জন্য নানা রংও ব্যবহার করা হয় -যেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। **পুষ্টিবাগানের** সবজি স্থানীয় মাটি, বৃষ্টি, তাপমান ইত্যাদি বুঝে বাছাই করা হয়। আর সেইসব গাছ-গাছালির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়, যেগুলির বংশবৃদ্ধি সহজেই হয় ও যেগুলি নানা কাজে লাগে।

প্রাক্-বর্ষায়, লাল শাক, গুয়ার শুঁটি, ঢ্যাঁড়শ, উচ্ছে, পুদিনা পাতা, রমা কলাইয়ের সাথে সাথে সজনে শাক, ফুল ও ডাঁটা, 'কাটুক' পাতা, নিমের কচি পাতা আদি খাওয়া ভাল, এবং এগুলি তাজা শাক-সবজির অভাব পূর্ণ করে।

এই মরশুমে ফল হিসেবে কাঁচা ও পাকা কুল, কচি আম ও আমড়া আদি খাওয়া যায়।

বর্ষায় মিঠা ও তিতা পাটের শাক, কুমড়োর শাক, পুঁই শাক, কুঁদরী শাক ও ফল, লম্বা বরবটি ইত্যাদি খাওয়া ভালো। বর্ষার গোড়ায় সিম, মাখন ও কামরাঙ্গা সিম, খামালু, শাঁকালু আদি লাগানো হয়, যেগুলিতে ফুল আসতে ৪-৫ মাস লাগে।

এইসময় এঁচোড়, কাঁচা ও পাকা আম, পাকা কলা, পেঁপে এবং নানা ধরনের লেবু পাওয়া যায়।

বর্ষা পরবর্তী মরশুমে ডাঙা কলমি, রাঙা আলুর শাক, টক ঢ্যাঁড়শের পাতা, বিট-গাজরের পাতা, মেথি পাতা, পালং শাক, ধনে পাতা ইত্যাদি পুষ্টিকর সবজি পাওয়া যায়। নোড়, কামরাঙা, কারিপাতা ইত্যাদি গাছের পাতাও নানা ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর।

এই মরশুমে ফরাসবিন, মটরশুঁটি, বাক্‌লা ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ অনেক শুঁটিজাতীয় ফসল বাগানে চাষ করা যায়।

এই সময়ে ফল হিসাবে কাঁচা বা ডাঁসা পেয়ারা, কয়েতবেল, পাকা পেঁপে, আমলকি, টমেটো, মিষ্টি কুমড়ো ইত্যাদি খাওয়া ভালো।

প্রত্যেক পুষ্টি বাগানেই রাঙা আলু, কচু, ওল, শিমূল আলু, খামালু প্রভৃতি কিছু শিকড় ও কন্দজাতীয় ফসল চাষ করা উচিত, যেগুলিকে বিশেষ দেখাশোনা করতে হয়না ও যেগুলি চাল-গমের অভাবের সময়, পেট ভরানোর কাজে লাগে।

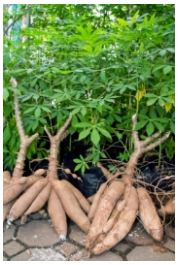

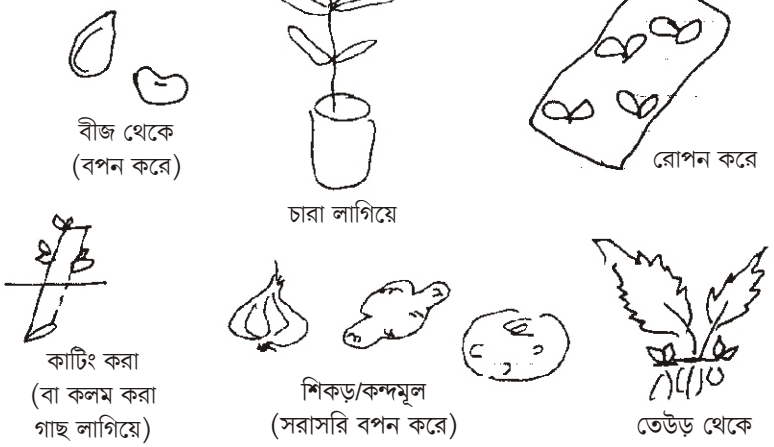

ফসল বংশবৃদ্ধির উপায়ও নানারকম হয়। কিছু শাকসবজি, গাছ ইত্যাদি বীজ থেকে হয়। কিছু শাখার কাটিং থেকে, কিছু তেউড় থেকে আর কিছু কন্দমূল থেকে। কোনো কোনো বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়, কোনো কোনো বীজ সরাসরি পোঁতা হয়, কোনো চারা 'ব্যাগে বা বেডে' তৈরি করে প্রতিস্থাপন করা হয়। পুষ্টিবাগানে, প্রধানতঃ নিজের বাগানের বা স্থানীয় বীজ ব্যবহার করা হয়।

ভাল বাগানী দলেরা নিজেদের ও প্রতিবেশী দলেদের সদস্যদের মধ্যে বিনিময় বা কেনাবেচার জন্য সাবধানে বাছাই ও পরিষ্কার করা এবং ধীরে ধীরে শোকানো বীজ, **কন্দ**, কলম আদির ভাণ্ডার গড়ে তুলবার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, এটাই কাম্য।

পুষ্টিবাগানে মরশুমি শাকসবজি ছাড়াও দীর্ঘজীবী গাছ লাগানো দরকার, কারণ এইসব গাছ শুকনো মরশুমেও কিছু পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে জোগান দিতে পারে। পাতা খাওয়া যায় এমন কিছু দীর্ঘজীবী গাছ-গাছালি সজনে, কারিপাতা, সাদা কাঞ্চন, বকফুল, 'কাটুক', আমড়া ইত্যাদি (এর অনেকগুলির ফুল, ফলও খাওয়া যায়)। ফলের জন্য লেবু, ছোট পেয়ারা, পেঁপে, নোড়, করমচা, আমড়া, কামরাঙা, ডুমুর ইত্যাদি ছোট বাগানে লাগানো যায়।

পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য বাগানে বা ভিতরের বেড়ায় প্রোটিন সমৃদ্ধ গাছ-গাছালি লাগানো উচিত। এজন্য তুঁত, সজনে, জয়ন্তী, গ্লিরিসিডিয়া, মাদার, কাঞ্চন, সুবাবুল ইত্যাদি লাগানো যায়।

ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বাসক, শিউলি, জবা, নিশিন্দা, করবী প্রভৃতি গাছ বাইরের বেড়ায় লাগানো সম্ভব। পুকুর ও জলা জমির ধারে থানকুনি, ব্রাহ্মী, জলকলমী, শোলাকচু, নুনে শাক ইত্যাদি আপনিই হয়। যেগুলি পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে আহরণ করে আনা বা বাগানে লাগানো যেতে পারে। এগুলি খুবই পুষ্টিকর ও খাওয়া মোটেই লজ্জার ব্যাপার নয়, বরং না খাওয়াই অজ্ঞতার পরিচয়।

এইভাবে বাগান তৈরি করলে, ফসল ও প্রাণী বৈচিত্র্যকে অনেকটাই ধরে রাখা যেতে পারে।

৭। **ফসল সুরক্ষা:** বেড়ার গাছের কথা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি তিন চারমাস পরপর ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার উচ্চতায় ছেঁটে দিলে বেশি ঘন হয়ে বাড়ে। মিনজিরি, নিম, বাবলা আদি কিছু গাছও বেড়ায় লাগিয়ে নিয়মিত ছাঁটাই করা যেতে পারে। এইসব গাছের বেড়া খাদ্য-পশুখাদ্য-জ্বালানি-ঔষধি হিসেবে তো কাজ করেই, কিন্তু এদের প্রধান কাজ হল হাওয়ার গতিবেগ ও দলের বাষ্পীভবন কমানো, শিকারি পাখি, গিরগিটি, মাকড়সা ইত্যাদিকে বাঁচতে ও বাসা বাঁধতে দেওয়া, যাতে তারা পোকা-মাকড় ধরে খায়।

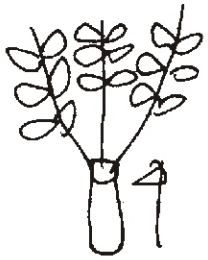

50-60 Cms কপিস্ করা
(গোড়ালিতে কাটা গাছ)

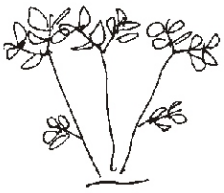

ডগা ছাঁটাই করা

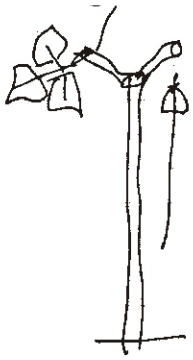

180-220 Cms
পোলার্ড করা
(ঘাড়ে কাটা গাছ)

থেঁতো করে রাতভর ভিজিয়ে সমপরিমাণ গোমূত্র ও ৫-৬ গুণ সাবান জল মিশিয়ে পাতায় ছেটানো
(এক-দু দিন রাখা যায়)
সপ্তাহে গাছ প্রতি ২০০-২৫০ মিলি লিটার দরকার

গন্ধযুক্ত পাতা আদি থেঁতো করে কেরোসিনে ভিজিয়ে ৫-৬ মাস রেখে দেওয়া যায়।
১ চা চামচ + ১ কাপ সাবান জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় তাড়ানোর জন্য নানান গন্ধযুক্ত,তেতো ও বিষাক্ত/দুধযুক্ত পাতার নির্যাসকে জলের সাথে মিশিয়ে, সেই জল পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নিম-করঞ্জের বীজ-গুঁড়ো বা খোল মাটিতে মিশিয়ে দিলে ফসলকে নানা রোগ থেকে মুক্ত রাখা যায়।

বেড়ার মাঝে, বা ফসলের সাথে মিশিয়ে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, তুলসী ইত্যাদি গাছ লাগিয়েও ক্ষতিকর পোকাকে তাড়ানো ও মৌমাছিদের আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

৮। **বাগানের বিন্যাস:** চাষের জমি, ফলের বাগান এখন বেশিরভাগই একফসলি, তাই এদের পোকামাকড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচানোও শক্ত। পুষ্টিবাগানে সাধারণতঃ জমি, জল ইত্যাদি কম পরিমাণ থাকে। তাই এমনভাবে গাছ-গাছালি, শাকসবজি ও পশুপাখির মেলবন্ধন তৈরি করা হয়, যাতে তারা একে-অপরকে বেড়ে উঠতে বা বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পারে। উঁচু **বহুতল মাচা** এর একটি উদাহরণ; যেখানে মাচার খুঁটিগুলি জীবন্ত গাছ, যেমন সজনে, বকফুল বা মাদার গাছ। এইসব গাছের গায়ে কামরাঙা বা মাখনশিম এর মতো খাড়া হয়ে ওপরে ওঠে এই ধরণের লতা চড়ানো হয়। মাচায় কুঁদরি বা সিম হয়, ধারে তেরছা করে লাগানো দড়ির পা পাটকাঠির ওপর পুঁইলতা চড়ানো হয়, নীচে ছায়াতে কচু, লংকা, আদা ইত্যাদি লাগানো হয়। ছোট ডোবা করে তাতে জিওলমাছ, ব্যাঙ বা গেঁড়িগুগলির চাষও করা যেতে পারে ।

পুষ্টি বাগানে মরশুমী শাক-সবজি ও স্থায়ী গাছ গাছালি ছাড়াও হাঁস, মুরগী, ছাগল, খরগোশ, গেঁড়ি গুগলি, মাছ, মৌমাছি আদি পশু-পাখি পালন ও তাদের নিয়ে আগাছা, ফসলের অবশেষ আদিকে সার তৈরির কাজে লাগানো যায় ।

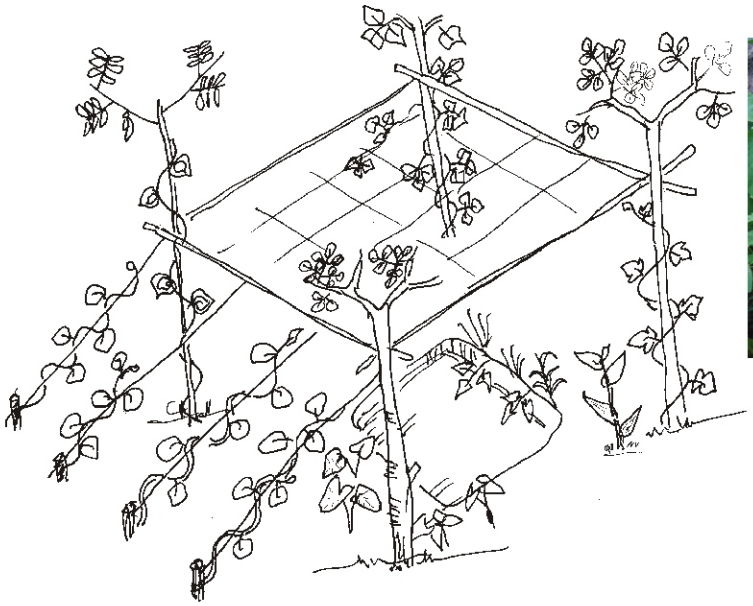

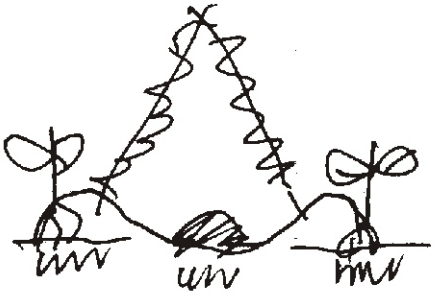

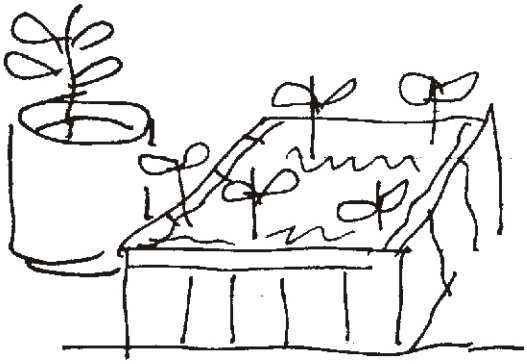

বহুতল মাচা ছাড়াও বৃত্তাকার বাগান, উঁচু বেড, বস্তার বাগান, পুকুর পাড়ে হাঁস-মুরগির বাড়ি তৈরির মধ্যে দিয়ে পুষ্টি বাগানে সু-সমন্বিত চাষ করা হয় । এখানে কোনও কিছুই ফেলা যায় না, আর বাইরে থেকে খুব একটা কিছু কেনার দরকারও পড়ে না । আপনারাও সহজেই পুষ্টি-বাগান করার উদ্যোগ নিতে পারেন ।

Supported by

ADAPTATION FUND

NABARD

Prepared by

DRCSC

For more information contact :

Development Research Communication and Services Centre

58A Dharmotala Road Bosepukur Kasba Kolkata 700 042

033 2442 7311, 2441 1646 | drcsc.ind@gmail.com | www.drcsc.org